North South University Library

সোমবার, ডিসেম্বর ২২, ২০২৫ ■ পৌষ ৭, ১৪৩২ বণিকবার্তা

এনএসইউ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল হান্নান চৌধুরী ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

শুধু দালানকোঠা বানালেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হয় না, আমাদের দরকার উপযুক্ত শিক্ষক

অধ্যাপক ড. আবদুল হান্নান চৌধুরী । নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (এনএসইউ) উপাচার্য ও গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান ।তিনি প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ও ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন । আবদুল হান্নান চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনের নর্থ ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি এবং অপারেশনস রিসার্চে এমএস ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া তিনি কানাডার ক্যালগারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ করেছেন । দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলেছেন বণিক বার্তার সঙ্গে । সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **বদরুল আলম**

অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র সংস্কারে অনেক কমিশন গঠন হয়েছে। শিক্ষা খাতে কোনো পরিবর্তনের প্রত্যাশা ছিল কি?

জুলাইয়ের অভ্যুত্থান ছিল মূলত তরুণদের দ্বারা পরিচালিত। তরুণদের ক্ষোভের বড় একটি কারণ ছিল এ শিক্ষা ব্যবস্থায় পাস করার পর তাদের জন্য পর্যাপ্ত চাকরির সুযোগ না থাকা। তাদের অর্জিত শিক্ষা যে বিশ্বমানের নয়, এ উপলব্ধি থেকেই তাদের মধ্যে বঞ্চনার বোধ তৈরি হয়েছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশা ছিল যে শিক্ষা খাতে বড় ধরনের একটি সংস্কার আসবে। আমরা যারা দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষাঙ্গনে আছি, তারা আশা করেছিলাম ভারত বা পাকিস্তানের মতো একটি স্বাধীন 'হায়ার এডুকেশন কমিশন' গঠন করা হবে, যা শিক্ষার মান ও গবেষণাকে একটি স্ট্রাকচারড মডেলে এগিয়ে নেবে। কিন্তু সরকার এখনো সেই উদ্যোগ নেয়নি। বর্তমানে ইউজিসি বা অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের মতো যেসব কমিশন আছে, তারা 'ফ্যাসিলিটেশন' বা সহায়কের চেয়ে 'কন্ট্রোল' বা প্রশাসনিক খবরদারিতে বেশি ব্যস্ত। ফলে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন এখনো আসেনি। তবে ভবিষ্যতে আমাদের এ শিক্ষা ব্যবস্থা রিভিজিট করতেই হবে।

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৭

শেষ পৃষ্ঠার পর

গত দেড় দশকে শিক্ষার মান নিয়ে বড় প্রশ্ন ছিল, এখনো সে অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। তাহলে এ সময়ের প্রজন্ম বা 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড'-এর আসলে কী অবস্থা?

সত্য বলতে আমরা আমাদের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুবিধা নিতে পারিনি। প্রতি বছর প্রায় ১০ থেকে ১৫ লাখ শিক্ষার্থী দ্বাদশ শ্রেণী শেষ করে বের হয়। কিন্তু আমরা তাদের উচ্চশিক্ষার সঠিক ধারায় আনতে পারছি না। আর যাদের আনছি, তাদেরকেও বৈশ্বিক মানের দক্ষতা বা জ্ঞান দিতে পারছি না। বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে, আমাদের দ্বাদশ শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থীর দক্ষতা বৈশ্বিক মানের তুলনায় অনেক নিচের স্তরের। আমরা প্রায়ই বলি যে আমাদের ছেলে-মেয়েরা বিদেশে গিয়ে খুব ভালো করছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো এরা মূলত 'সেলফ-মেড'। প্রতিষ্ঠান বা সিস্টেমের কারণে তারা ভালো করছে না, বরং নিজেদের ব্যক্তিগত স্পৃহা ও চেষ্টায় তারা জ্ঞান অর্জন করছে। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাঠামোতে স্বাধীনতা, নমনীয়তা ও ফোকাসের অভাব রয়েছে। এ সমস্যার শুরুটা হয় একদম প্রাথমিক পর্যায় থেকে। আমরা শিশুদের নৈতিকতা, মূল্যবোধ বা খেলাধুলার মাধ্যমে শেখার সুযোগ না দিয়ে মুখস্থবিদ্যার ওপর জোর দিচ্ছি। ফলে জ্ঞানচর্চার জায়গাটিতে আমরা একটি ভুল ধারণার ওপর বসে আছি এবং একটি মানহীন গ্র্যাজুয়েট তৈরি করছি।

বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মূল সংকটের জায়গাটি কোথায়?

শিক্ষা ব্যবস্থার সংকটকে কোনো একটি নির্দিষ্ট উপাদানের ওপর চাপানো যাবে না। এটি একটি সামগ্রিক ইকোসিস্টেমের ব্যর্থতা। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব স্তরেই যোগ্য ও উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। অযোগ্য শিক্ষক জাতির জন্য বোঝা বা 'বারডেন' হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা শিক্ষার গুণগত মানের চেয়ে সংখ্যার দিকে বেশি নজর দিয়েছি। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এখন মূলত সার্টিফিকেট ও ডিগ্রি অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে শিক্ষার্থীরা বিশ্লেষণধর্মী দক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জন করতে পারছে না।

আমরা মাদ্রাসা শিক্ষাকে মূলধারার সঙ্গে সমন্বিত করতে পারিনি। সরকার মাদ্রাসা শিক্ষাকে ম্যাট্রিক বা ইন্টারমিডিয়েটের সমতুল্য করেছে ঠিকই, কিন্তু সেই মানের জ্ঞান অর্জনের নিশ্চয়তা দেয়নি। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ভাষা (ইংরেজি), গণিত বা বিজ্ঞান শিখিয়ে যদি দুটোর সমন্বয় করা যেত, তবে শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি উপকৃত হতো। এ স্ট্রাকচারাল রিভিজিট বা সংস্কার করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি।

বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ। আমাদের ধারণা, কেবল জীববিজ্ঞান পড়লে ডাক্তার আর গণিত পড়লে ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যায়। অথচ উন্নত বিশ্বে লিবারেল আর্টসের শিক্ষার্থীরাও মেডিকেলে পড়ার সুযোগ পায়। শিক্ষার এ প্রথাগত দেয়াল ভেঙে জ্ঞান অর্জনের পথকে সবার জন্য উন্মুক্ত করা প্রয়োজন। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান এখন পুরোপুরি প্রযুক্তিনির্ভর। সিনহুয়া ইউনিভার্সিটির মতো প্রতিষ্ঠানগুলো এখন ডাক্তার হওয়ার আগে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। একইভাবে একজন ইঞ্জিনিয়ারের জন্য ড্রামা বা মানবিক বিদ্যা শেখা জরুরি; কারণ আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ সব ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। শিক্ষার প্রতিটি স্তর হওয়া উচিত আন্তঃসম্পর্কিত। কেবল নির্দিষ্ট বিষয়ে নম্বর দিয়ে মেধা যাচাই না করে, শিক্ষার্থীদের এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে যাওয়ার স্বাধীনতা দিতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনে একে আরো উন্মুক্ত করতে হবে, যাতে যেকোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের মেধাবী শিক্ষার্থী তার পছন্দের উচ্চতর বিদ্যায় অবদান রাখতে পারে।

শিক্ষা খাতের বিভিন্ন সংকট থেকে উত্তরণে বাজেটের গুরুত্ব কতটুকু?

বাজেটের ক্ষেত্রে আমরা মারাত্মকভাবে পিছিয়ে আছি। বৈশ্বিক মানদণ্ডে শিক্ষা খাতে জিডিপির ৬ শতাংশ খরচ করার কথা থাকলেও আমরা মাত্র ২ থেকে ২ দশমিক ৫ শতাংশ করছি। এর জন্য ২০ বছরের দীর্ঘমেয়াদি কৌশল নিতে হবে। আগামী চারটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ধারাবাহিকভাবে বাজেট বৃদ্ধি এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করতে হবে। বাজেট একবার বাড়িয়ে আবার কমিয়ে ফেললে কোনো ফল আসবে না। আমরা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের ওপরে আছি। আগামী ৩০ থেকে ৪০ বছর আমাদের অবশ্যই এ জায়গাটা গুরুত্ব দিতে হবে। এ বিশাল জনশক্তিকে যদি আমরা বৈশ্বিক মানের শিক্ষা দিতে না পারি, তবে তারা হাইলি ভ্যালুড হওয়ার পরিবর্তে সমাজের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

সমাজের বিভিন্ন অস্থিরতা কি গত দুই দশকের শিক্ষা ব্যবস্থার ফল? এ বিষয়ে আপনার পর্যবেক্ষণ কী?

গত দুই দশকে আমাদের জাতির পুরো চিন্তাধারা এবং মনস্তত্ত্বকে ভিন্ন এক দিকে প্রবাহিত করা হয়েছে। ২০ বছর আগে যে শিশুটি জন্মেছিল, সে এখন রাজপথে। সে এমন এক বাংলাদেশ দেখেছে, যা ছিল নিপীড়িত ও বিভক্ত। সে দেখেছে দেশটা কেবল একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য, তার জন্য কোনো সুযোগ খোলা নেই। উন্নত বিশ্বে মেধা থাকলে একজন শিক্ষার্থী যেকোনো অবস্থান থেকে উঠে আসতে পারে, কিন্তু আমাদের এখানে রাষ্ট্র নিজেই এক ধরনের ন্যারেটিভ বা আইডিওলজি চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে, যা শেষ পর্যন্ত দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। মানুষকে কোনো দর্শন জোর করে গেলাতে গেলে হিতে বিপরীত হয়, বাংলাদেশেও তাই হয়েছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও প্রযুক্তির প্রভাব উচ্চশিক্ষায় কীভাবে পড়বে বলে মনে করেন?

এআই নিয়ে আমাদের দুইভাবে ভাবতে হবে। এক. এআই প্রযুক্তি হিসেবে শেখা (কোডিং, প্রোগ্রামিং)। দুই. এআইয়ের ব্যবহারিক প্রয়োগ (স্বাস্থ্য, ব্যবসা বা সমাজের সমস্যা সমাধানে)। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে আমাদের 'ইন্টেলিজেন্স মেশিন ল্যাব' আছে, যেখানে আমাদের ফ্যাকাল্টি ও ছাত্ররা বিশ্বমানের গবেষণা করছে। এছাড়া আমরা গুগলের সহযোগিতায় বাংলাদেশের প্রথম 'সাইবার সিকিউরিটি ক্লিনিক' এবং একটি অত্যাধুনিক 'ফ্যাব ল্যাব' ও 'ইনোভেশন হাব' তৈরি করছি। আমরা চাই বিশ্ববিদ্যালয় কেবল পেপার পাবলিশ না করে কমিউনিটির সমস্যা সমাধানে সরাসরি ভূমিকা রাখুক।

উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) বা নিয়ন্ত্রক সংস্থার ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত?

ইউজিসি যে আউটকাম বেসড কারিকুলাম বা কোয়ালিটি সেল (IQAC) গঠনের কথা বলে, তা ইতিবাচক। কিন্তু সমস্যা হলো, তারা সব বিশ্ববিদ্যালয়কে একই পাল্লায় মাপে। একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আর ৩৫ বছরের পুরনো প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সক্ষমতা এক নয়। উন্নত বিশ্বের মতো আমাদেরও প্রতিষ্ঠানগুলোকে 'টায়ার' বা ক্যাটাগরি অনুযায়ী ভাগ করে সেই অনুযায়ী স্বাধীনতা দেয়া উচিত। সেরা প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাধীনতা দিয়ে বলা উচিত—'তোমরা তোমাদের মতো কাজ করো, ২০ বছর পর আমরা ফলাফল দেখব।' অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ বা সবকিছুতে নাক গলালে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে।